বাঙালির চলচ্চিত্র - সংস্কৃতি
রজত রায়

প্রায় গোটা বিংশ শতাব্দীজুড়ে সৃষ্টি ও মননের চর্চা চালিয়ে যে অর্থে ফরাসি দেশ একটা ফরাসি চলচ্চিত্র - সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছে, যে অর্থে বার্গম্যানের দেশ সুইডেন তার একটা নিজস্ব চলচ্চিত্র - সংস্কৃতির রূপরেখা সৃষ্টি করতেপেরেছে, শতাব্দীর প্রায় নয়টি দশক ধরে নিরলস চর্চা, অধ্যয়ন ও অনুশীলনের দ্বারা যে ব্রিটিশ জাতিও একটা চমৎকার ফ্লিম কালচারের পরিমন্ডল তৈরি করে নিয়েছে, ফ্লিম কালচারের দিক থেকে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও যে অন্যন্য ইতিহাস রচনা করেছে, সেই অর্থে বাঙালির কোনও চলচ্চিত্র - সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে কি? একুশ শতকের সূচনার মুখে দাঁড়িয়ে আজ একবার পিছন ফিরে বাঙালির চলচ্চিত্রচর্চার ইতিহাসটার দিকে তাকতে ইচ্ছে করছে।

ভান্ডার যে খুব দরিদ্রতা নয়। গোটা পৃথিবীতে যেমন বিনোদন ও শিল্পের স্বার্থে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই চলচ্চিত্রচর্চার কাজ শুরু হয়ে গেছে, বাঙালি জাতির ইতিহাসওে প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ফ্লিম বা চলচ্চিত্রের সঙ্গে বিশ শতকের নয়টি দশক ধরে বাঙালি জড়িয়ে আছে। কলকাতায় প্রথম নির্বাক ছবিটি তৈরী হয়েছিল ১৯১৭- তে, প্রথম সবাক ছবি তোলা হয় ১৯৩১ - এ। বাংলায় চলচ্চিত্র - বিষয়ক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৯ - এ। অর চলচ্চিত্র নিয়ে প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০- এ।কাজেই সূচনার কাজটি ভালই হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে তার বিকাশের ইতিহাসও কম আকর্ষণীয় নয়। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৪ প্রর্যন্ত ১৮ বছরে কলকাতা থেকে মোট ১১৯ টি নির্বাক ছবি তোলা হয়েছিল। আর ছবিতে শব্দ ও কথা যোগ হওয়ার পর ১৯৩১ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন পর্যন্ত কলকাতা থেকে বাংলা ভাষায় মোট কাহিনীচিত্র তোলা হয়েছে প্রায় দুই হাজার দুশো তিরিশটি (২২৩০)।

ভারতবর্ষে ফ্লিম সোসাইটি আন্দোলনও প্রকৃত অর্থে কলকাতা থেকেই শুরু হয় ১৯৪৭এর অক্টোবর মাস থেকে। সেইদিন থেকে শুরু করে নানা উত্থান - পতনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার বুকে গত অর্ধশতকে প্রায় পঞ্চাশ - ষাটটি ফ্লিম সোসাইটির সংগঠন হয়েছে। ১৯২৯ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলায় কেবল মাত্র চলচ্চিত্রচর্চার জন্যই প্রায়১০০-র কাছাকাছি সাময়িক পত্রিকাবেরিয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে ৮০/৮৫ টি পত্রিকাই ছিল অনিয়মিত এবং ক্ষীণজীবী।

আর প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা বলতে গেলে ১৯৩০ থেকে১৯৯৯ পর্যন্ত এই সাতটি দশক ধরে ৩০০ -র কিছু বেশি বই। যদিও এই ৩০০-র ভেতরে ২০০-র মত বই অধুনা দুষ্প্রাপ্যএবং ইতিহাসের গর্ভে আশ্রিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ জোর দিয়ে বলতে পারি এই ৩০০র ভেতরে অন্তত ৮০/৮৫ টি বই রীতিমতো উচ্চমানের।চলচ্চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে এই বইগুলি বাংলাভাষী মানুষকে প্রভুত সাহায্য করেছে।

সঞ্চয়ের ঘরে আরও আছে। ১৯৫২ সালে কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে মাঝারিও বড় মাপের অন্তত ২০/২২ টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এই কলকাতা শহরেই হয়েছে।যার দর্শকও ছিলেন মূলত বাঙালি।

যে রাজ্যে চুরাশি বছর ধরে মোট ২৩৫০- টির বেশি সিনেমা তোলা হয়েছে, প্রায় ১০০ ছোট - বড় চলচ্চিত্র - বিষয়ক পত্রিকা বেরিয়েছে, ৩০০-টির বেশি চলচ্চিত্রচর্চার বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে এবং ৫০/৬০ টি ক্লিম সোসাইটি সক্রিয় ছিল, সেই রাজ্যে এই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটা নিজস্ব চলচ্চিত্র - সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, এটিই ছিল স্বাভাবিক।সবার ওপরে গোটা পৃথিবীকে এই রাজ্যই উপহার দিয়েছে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের মত বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকারকে।

১৯৮৫ থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী আরেকটি অমূল্য সম্পদ হাতে পেলেন । কলকাতায় নন্দন চলচ্চিত্র কমপ্লেক্সের উদ্বোধন হল। সেই থেকে একটানা ১৫ বছর ধরে নন্দন চলচ্চিত্রচর্চার এক বিশাল দিগন্ত আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, তা সাহিত্যের ফোটোগ্রাফড ভার্সান নয়। পথের পাঁচালি শিক্ষিত বাঙালি সমাজে একটা আলোড়ন নিয়ে এল। গোটা পৃথিবী জুড়ে ছবিটি বন্দিত হওয়ায় সচেতনা বাঙালি দর্শক যেন দীর্ঘদিনের ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন সিনেমা শুধুই বিনোদন নয়, তা দিয়ে মহত্তম শিল্প সৃষ্টিও সম্ভব। একই সঙ্গে এসে গেলেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেন। বাংলা সিনেমায় নতুন প্রাণসঞ্চার হল । এই তিনজন পরিচালক কেবল মাত্র যে ছবি তুললেন তা-ই নয়, দর্শককে যোগ্য ও শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণ লেখালেখিও করলেন।

দুই দশকের মধ্যে পশ্চিমবাংলার পরিমন্ডলে একটা চলচ্চিত্র- সংস্কৃতির আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেল। এর সঙ্গে যোগ হল ক্লিম সোসাইটির পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত আর্ন্তজাতিক স্তরে ভাল সিনেমা নিয়ে চিন্তা ভাবনা। দর্শকের মনের দিগন্ত অনেক প্রসারিত হয়ে গেল এবং তাঁর ভাবনা- চিন্তার পরিধি বহুগুণে বিস্তৃত হল। বাংলায় প্রকাশিত হতে থাকল চলচ্চির্রচর্চার উপযোগী উচচমানের একগুচ্ছ বই। সত্তরের দশকে এসে ভাবলাম আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি। ক্লিম সোসাইটি আন্দোলন কলকাতা শহর ছাড়াও পশ্চিমবাংলার গোটা পনেরো জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। প্রচুর সেমিনার হতে থাকল, কমবয়সী ছেলেমেয়ের দল অনেক উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এল। আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এগিয়ে এলেন।

প্রায় দেড় দশক ধরে তারা গোটা পনেরো ভাল বাংলা ছবি প্রযোজনা করলেন। এই দশকেই নন্দনের আবির্ভাব। নন্দন যে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল, তা একেবারে বিশ্বমানের। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে

বলতে পারি চলচ্চিত্রচর্চার তীর্থক্ষেত্রগুলি লন্ডন, স্টকহোম, মন্ট্রিয়াল, অটোয়া, শিকাগো এবং নিউ ইয়র্কের থেকে কলকাতার নন্দনের সুযোগ - সুবিধা কোনও অংশে কম নয়।

এত কিছু সত্ত্বেও বাঙালির চলচ্চিত্র - সংস্কৃতি কিন্তু খুব বেশি দূর এগোতে পারল না। পতনটা লক্ষ করা গেল আশিরদ শকের মধ্য ভাগ থেকেই। টালিগঞ্জের সিনেমা জগতে একদল ভুঁইফোঁড় অর্ধশিক্ষিতের আবির্ভাব ঘটল, যারা বাংলা ছবির মানকে নীচে টানতে টানতে একেবারে বেলেল্লাপনা এবং যাত্রার স্তরে নিয়ে এলেন। ক্লিম কালচারের হাওয়ায় নিম্নগতি লক্ষ করা গেল ।

ভাল সিনেমার বদলে দূরদর্শন এবং ভিডিও - র মাধ্যমে বোম্বাই -এর বেলেল্লাপনা বাংলার একেবারে ঘরে ঘরে ঢুকে গেল । এবার আর শুধু শহর নয়, পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে (এমন কী যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানেও) ভিডিও মারফত ভাল্‌গার হিন্দি ছবি সাধারণ বাঙালির মনোজগৎকে কব্জার মধ্যে ধরে ফেলল । সিনেমার সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগও ক্রমশ ঢিলে হতে থাকল ।

১৯১৭ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত মোট ১৭৮৮ টি নির্বাক ও সবাক বাংলা ছবির মধ্যে সাতশ চল্লিশটির কাহিনী ছিল সাহিত্য ভিত্তিক। কিন্তু ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ - এর মধ্যে মোট ৫৬২ টি ছবির মধ্যে সাহিত্য ভিত্তিক ছবি মাত্র সাতাশটি। বাঙালি দর্শক সিনেমাতে নিটোল সাহিত্যধর্মী ন্যারেটিভের পরিবর্তে হই- হুল্লোড়, মার দাঙ্গা, কুৎসিত নর্তক - কুর্দন দেখাটাই বেশি পছন্দ করতে থাকলেন। তাঁরা সিনেমাকে সিনেমা বলতেও ভুলে গেলেন । মুদ্রিত পুস্তক পাঠের অভ্যাস যত কমে আসতে থাকল বাঙালি দর্শক তত আরও বেশি করে ‘বই’ দেখতে থাকলেন। তাঁরা নানা রকমের বই দেখতে থাকলেন। বই পড়া যত কমে গেল, তত বেড়ে গেল বই দেখা - টিভির ‘বই’, হলের ‘বই’ ।

এর কারণটা কি? ভারতবর্ষেরই আরেকটি রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে তুলনা করলেই তফাতটা পরিষ্কার ফুটে উঠবে। আজ এদেশের ২৬ টি রাজ্যের মধ্যে সাক্ষরতা এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে কেরল রাজ্যটি। তার ফলে দেখতে পাচ্ছি কেরলে গত বিশ বছরে যতগুলি ভাল ছবি তোলা হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবাংলায় তা হয়নি। কোনরকম সরকারি অনুদান ছাড়াই কেরলে এখন প্রতি বছরে গোটা দশেক করে ভাল ছবি, গোটা ২০/২৫ মধ্যমানের পরিচ্ছন্ন ছবি তোলে হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক দিক থেকে তা সাফল্যও অর্জন করে। পশ্চিমবাংলায় আমরা কিন্তু এই জিনিসটি পাচ্ছিনা। কারণ কেরলের সাধারণ দর্শকের শিক্ষা - দীক্ষার মান আজকের পশ্চিমবাংলার থেকে উন্নত। ফলে সাধারণ মালয়ালম ছবি মালয়ালম দর্শকের আনুকূল্যেই টিকে থাকতে পারে। কিন্তু গত দুই দশকে ভাল এবং মাঝারি মানের বাংলা ছবি রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের (এন এফ ডি সি) পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেনি। অবশ্যই এর কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছে। সেই দৃষ্টান্তই দেখিয়ে চলেছেন গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন এবং ঋতুপর্ণা ঘোষরা। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই, তা সাধারণ ধর্ম নয়।

বাজার চলতি যে ছবিগুলি আজকাল জনপ্রিয় হয়ে থাকে, সেগুলিকে আমি কেবলমাত্র বাংলা সিনেমারই কলঙ্ক বলতে চাই না, সেগুলো আদপেই সিনেমা নয় এবং কোনরকম আলোচনার যোগ্যও নয়। যে বাঙালি দর্শকের আনুকূল্য এইছবি গুলি পাচ্ছে, তাঁরা কারা? অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, শিল্পজ্ঞানহীন দর্শকের দল। এই দর্শকের সাহিত্যচর্চার কোন পটভূমি নেই, শিল্পানুরাগের কোন প্রকাশ নেই এবং সবচাইতে দুঃখের বিষয়, ভাল আর মন্দকে চিনবার শক্তি পর্যন্ত এঁদের নেই। অপর্ণা সেনের যুগান্ত কোন দর্শক পায় না, রাজা মিত্র, অশোক বিশ্বনাথ কিংবা বিপ্লব রায়চৌধুরীকে বাঙালি দর্শক প্রায় চেনেনই না।

গত দশ - পনেরো বছরেই এই বৈপরীত্যটা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।একদিকে যখন একের পর এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে চলেছে, কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র চর্চা নিয়ে আকাদেমি স্তরে পঠন - পাঠনের কাজ শুরু হয়েছে, বেশ কিছু ভাল বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু পরিশীলিত দর্শককে দেখা যাচ্ছে কমবয়সী যুবক যুবতিদের মধ্যে, ঠিক তখনই সাধারণ বাঙালি দর্শকের মান নীচে নামতে নামতে একেবারে পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে।অনেক দিন আগে ঋত্বিক ঘটক এঁদের উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন , 'সারি সারি পাঁচিলের মধ্যে আপনারাও একটি বড় পাঁচিল।

আশির দশক পর্যন্ত প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র উৎসব হত প্রয়োজনীয় সিরিয়াসনেস নিয়ে। সমালোচক এবং অতিথিবৃন্দকে উৎসব শুরু হওয়ার আগেই সমস্ত ছবির পরিচিতি জানিয়ে প্রকাশিত বই বিতরণ করা হত। তার ফলে প্রাগ্রসর দর্শকেরা জেনে বুঝে প্রত্যেকটি ছবি দেখতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে তা সময় থাকতেই জানিয়ে দিতেন।ফলে ভাল ছবিগুলি দেখবার একটা আগ্রহ গড়ে উঠত। কিন্তু নব্বই-এর দশকে এসে দেখতে পাচ্ছি সরকারি এবং বেসরকারি যে -কটি চলচ্চিত্র উৎসব হল, তার একটিতেও (কেবলমাত্র ১৯৯০-এর উৎসব টি ছাড়া) দর্শককে, অন্তত দর্শকের প্রাগ্রসর শ্রেনীটিকে, দেশ-বিদেশের শত শত ছবির কোন পূর্ব পরিচিতি জানানো হয়নি। ফলে দর্শক আন্দাজে ছবি দেখতে ঢুকেছেন অন্ধকারে ঢিল মারার মত পরিবেশে। ছবিগুলির পরিচিতি জানিয়ে চড়া দামে এবং অনেকক্ষেত্রেই অসময়ে যে স্যুভেনির গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে মূল দর্শকদের ০.৫ শতাংশও সেই স্যুভেনির গুলি কেনেননি, কেনেননি, পড়েননি। তাঁরা মজা পেতে ছবি দেখেছেন, কেউ কেউ মজা পেয়েছেন, অনেকেই তা পাননি । এভাবে চলচ্চিত্রচর্চা হয় না। এটা শিল্পের জগতের নীতিবিদ্ধ কাজ।

প্রতিকার কোন পথে? একুশ শতকে আমরা যদি নিজেদের একটা যথার্থ চলচ্চিত্র - সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই, তাহলে প্রথম কাজটাই হবে শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা। বিদ্যালয়স্তর থেকেই ফ্লিম সেন্স বা চলচ্চিত্রবোধ গড়ে তোলবার উপযুক্ত পাঠক্রম চালু করা দরকার। যে কাজটি করা হয়েছে পৃথিবীর উন্নত প্রথম সারির দেশগুলিতে। ব্যাপক মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে, (জাঁ-লুক গোদার - এর ভাষায়) তাঁদের বোঝাতে হবে ''এ ফ্লিম ইজ এ ফ্লিম, ইজ এ ফ্লিম''।